রেবতী সন্ন্যাসীর স্ত্রী। সন্ন্যাসীর অবশ্য স্ত্রী থাকা সম্ভব নয়, কেননা সংসারের সঙ্গে যদি আগে সম্পর্ক থেকেও থাকে, সন্ন্যাস গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পর্ক একেবারেই লোপ পেয়েছে। কিন্তু রেবতী সন্ন্যাসিনী নয়। সে হয়তো মনে করে—এইজন্য বললাম, ঠিক ঠিক মনে করে কি না, অথবা মনে করতেও সাহস করে কি না—সে বিষয়ে একটু সন্দেহ আছে।

রেবতীকে আমি প্রথম দেখি গঙ্গার ঘাটে। ঘাটের সিঁড়ির উপর দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে আছে। দেখে মনে হলো, তার পাশে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আমি চিনতাম—সে শেবাশ্রমের শেবিকা গিরিবালা। আমি কাছে গিয়ে গিরিবালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে? মেয়েটি কেন এভাবে বসে আছে?"

গিরিবালা বিরক্ত মুখে উত্তর করল, "দেখুন না কি বিপদ! শেবাশ্রমে শেবিকা হতে এসেছে, যদি এমনি করে দিনরাত কান্নাকাটি করে, তবে শেবার কাজ করবে কি করে? উল্টে ওরই শেবা করতে হবে দেখি।"

গিরিবালার কথাতেই তার পরিচয় পেলাম—মেয়েটি অচ্ছুতানন্দ স্বামীর স্ত্রী। অচ্ছুতানন্দ স্বামীর ত্যাগ, তাঁর বিরাগ, তাঁর অপূর্ব পাণ্ডিত্য এবং সাধনার কঠোরতার কথা আমি আগে বহুবার শুনেছি। আশ্রমবাসীদের কাছে তিনি পরম শ্রদ্ধার পাত্র। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি যেন সাধনার সমুদ্রে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন। দিনরাত, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্ম—সব অনুভূতিই যেন তাঁর লোপ পেয়েছিল।

তাঁর দীক্ষাগুরু মহারাজ বলেছিলেন, "অচ্ছুত যে ভাবে সাধনায় ডুবে যাচ্ছে, তার দেহ থাকলে হয়।" এইভাবে দুই বছর কেটে গেল।

আমি জানতাম না যে তাঁর পূর্বাশ্রমে স্ত্রী রয়েছে। মেয়েটি কিভাবে শেবাশ্রমে শেবিকা হলো? আর যদি শেবিকা হয়েও থাকে, তবে এত কান্নাকাটি করছে কেন?

গিরিবালা জানত, সে আমাকে বলল—অচ্ছুতানন্দ যখন সন্ন্যাস নিতে আসেন, তখন তাঁর স্ত্রী, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল। স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য কিছু সম্পত্তি ও নগদ টাকা রেখে এসেছিলেন। কিন্তু যাঁর কাছে দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলেন, তিনি আর সেই ব্যবস্থা রাখেননি।

অচ্ছুতানন্দ স্বামী বিদেশে থাকা অবস্থায় একদিন একটি পত্র পেলেন, তাতে খবর ছিল তাঁর ছেলে খুব অসুস্থ। গুরুদেবকে জানালে গুরু বললেন, "বৎস, বিরজা হোমে আহুতি দিয়ে যেদিন তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছ, সংসারের সমস্ত সম্পর্ক সেইদিন ছিন্ন হয়ে গেছে। ভগবানের বৃহৎ সংসার, তিনি তাঁর ভার বহন করবেন। তুমি আমি কিছুই করতে পারি না।"

এরপর আরেকটি পত্র এলো—ছেলের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে। আবার কিছুদিন পরে কন্যার মৃত্যুসংবাদও এলো।

তারপরও আরও দুই বছর কেটে গেল। এসময়ে অচ্ছুতানন্দের নামে আরও কয়েকটি পত্র এলো। গ্রামের এক সর্দারের কাছ থেকে প্রথম পত্রে জানানো হলো, রেবতী ভীষণ দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছে। শেষ পত্রে বলা হলো, রেবতীকে আশু রক্ষার ব্যবস্থা না করলে বিপদ ঘটতে পারে, কারণ গ্রামের জমিদারের পুত্র তার উপর দৃষ্টি দিয়েছে।

অচ্ছুতানন্দের কাছে এই সংবাদ পৌঁছালে তিনি গুরুদেবকে বললেন, “মহারাজ, আমার এখানে থাকা চলে না।” কিন্তু মহারাজ বললেন, “বৎস, সংসার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে বহু আগে। ভগবানের ইচ্ছাই সব।”

অবশেষে রেবতী আশ্রমে এল। কিন্তু শেবার কাজ সে কিছুই জানত না, মন দিয়েও শিখতে চাইত না। তিরস্কারেও তার সংশোধন হচ্ছিল না। বরং ফাঁকা পেলেই নির্জনে বসে কান্নাকাটি করত।

শেবাশ্রমে সাধারণ শেবিকা ও উচ্চশ্রেণীর পরিচালিকা উভয়ই ছিল। রেবতীর উপর প্রধান পরিচালিকা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি ছিলেন কঠোর প্রকৃতির মানুষ, হৃদয়ে আবেগের স্থান ছিল না। রেবতীর কান্নাকাটি তাঁকে বিরক্ত করত। কিন্তু তাকে তাড়ানো যেত না। তাই কোনো কাজে নিয়োজিত করবার চেষ্টা করা হতো।

আমি বললাম, “রেবতী, আমি তোমার দিদি হয়ে থাকি, আমাকে দিদি বলবে কেমন?”
রেবতী বিস্মিত চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃদুস্বরে বলল, “আচ্ছা।”

এভাবেই ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে তার সখ্য হলো। আমি প্রায়ই তার জন্য আশ্রমে যেতাম। মনে হতো—অত দুঃখ সহ্য করেছে, ভগবান কি তাকে শান্তি দেবেন না?

আমি বলতাম, “রেবতী, দিনরাত চোখের জল ফেলো না, এতে স্বামীর অকল্যাণ হয়।”
রেবতী রাগ করে বলত, “আমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক যে আমার চোখের জলে তার অকল্যাণ হবে?”

এরপর কিছুদিন পরে জানা গেল, অচ্ছুতানন্দ স্বামী তীর্থভ্রমণে গিয়েছেন। মালতী এসে রেবতীকে সংবাদ দিল। রেবতী তখন যেন অস্থির—কখনো বলল, “আমার কি, আমি চতুর্ভুজ যাব।” আবার কখনো ক্ষুব্ধ স্বরে কিছু বলত।

একদিন সন্ধ্যারতি শেষে দেখি, রেবতী আর মালতী দুজনে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। রেবতী বলল, “আমাকে মাপ কর ভাই, আমার মাথা ঠিক নেই, দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। তুমি কেবল আমাকে বোনের মতো ভালবাসো।”

এরপর শেবাশ্রমে মহামায়া দেবী নামে এক ধনী মহিলা রোগিণী এলেন। তিনি রেবতীর শেবায় সন্তুষ্ট হলেন। মাঝে মাঝে বলতেন, “বাড়ি ফেরার সময় তোমাকে নিয়ে যাব।” রেবতী বিশেষ উত্তর দিত না, কখনো আস্তে বলত, “মহারাজেরা যদি মত করেন।”

একদিন মহামায়া দেবীর জন্য রেবতীকে শাখা-সিদুর পরিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু বাইরে বের হয়ে দেখা গেল, রেবতী সিন্দুর মুছে ফেলেছে, শাখা-লোহার বালা খুলে ফেলেছে। তবু মহামায়া দেবী খুব টান অনুভব করতেন তার প্রতি।

এরপর বসন্ত রোগ দেখা দিল রেবতীর গায়ে। তাকে সংক্রামক ওয়ার্ডে রাখা হলো। মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত অবস্থায় সে বলত, “আমার স্বামীকে একবার দেখতে চাই।”

মালতীর মাধ্যমে এ সংবাদ অচ্ছুতানন্দ স্বামীর কাছে পৌঁছাল। অবশেষে তিনি এলেন। সারারাত রেবতীর শিয়রে বসে রইলেন, মাঝে মাঝে মুখে জল দিলেন, কানে কানে কিছু বললেন—সম্ভবত ভগবানের নাম।

ব্রাহ্ম মুহূর্তে রেবতী তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হাত চেপে ধরল এবং শান্তভাবে চোখ বন্ধ করল।